ময়না

মাহমুদুল খান

দক্ষিণের জানালার ঠিক বরাবর, লাইট পোস্টের মাথার ওপর বসে দাঁড় কাঁকটা অনবরত ডেকেই যাচ্ছে। কা কা কা––––। শীতের ভোরে, কুয়াশার ঘোমটা টানা সুনশান চারিধার। পাশের সরু গলিতে রিক্সার টুন টুন ঘন্টা নেই, ফেরিওয়ালাদের হাঁক ডাক নেই, কলতলায় পানি নিতে আসা মাতারীদের খিস্তি খেউড় নেই। সমস্ত দিনের মধ্যে এই সময়টাই ময়নার কাছে সবচাইতে ভাল লাগে। কিন্তু আজকে এই বেজাত দাঁড় কাঁকটার কর্কশ কন্ঠের কা কা ডাক সুন্দর, স্নিগ্ধ ভাল লাগার ভোরটাকে তেতো স্বাদে ভরিয়ে দিতে চাইছে। বিরক্ত হয় ময়না। একবার মনে হয় উঠে গিয়ে ঢিল ছোঁড়ে কাঁকটার গায়ে। কিন্তু কি দিয়ে ঢিল ছুড়বে সে? ময়নার শিয়র বরাবর রান্না ঘরের দেয়াল ঘেষে পানির কল, কলের নীচে গত রাতের এঁটো থালা বাসন, হাড়ি পাতিল রাখা আছে। খোঁজা খুঁজি করলে নিশ্চয়ই উচ্ছিষ্ট হাঁড় গোড় পাওয়া যেতে পারে। পাতিল হাতড়ে হাঁড় খোঁজার উদ্দেশ্যে আড়মোড়া ভাঙ্গে ময়না। পরক্ষণেই ছেঁড়া কাঁথার ফাঁক ফোকর দিয়ে হুড়মুড়িয়ে টালকা বাতাস ঢোকে ।

- উ- মা-মাগো, নাইজ্যের টাল পড়ছে গো। হাঁটু জোড়া প্রায় থুতনির কাছে এনে ছেঁড়া কাঁথাটা আরও ভাল করে জড়িয়ে শীত ঠেকানোর চেষ্টা করে সে।

- দুরো যা কাউয়া, মরার কাউয়া, বিজরমার ঘরের বিজরমা। পোস্টের ওপর দন্ডায়মান, কা কা রত বৃদ্ধ দাঁড় কাঁকটা ময়নার এই স্বগতোক্তি শুনতে পায়না। আপন মনে ডাকতে থাকে, কা কা কা। কাঁকের উদ্দেশ্যে গালি দিয়েই জিবে কামড় দেয় ময়না। বিজরমা কথাটার মানে সে জানে না, তবে কথাটা যে মন্দ তা সে ঠিকই বোঝে। এসব কথা আগে সে জানত না। সদর ঘাট বস্তিতে ওঠার পর থেকেই এসব শব্দের সাথে পরিচিত হতে শুরু করেছে সে। বস্তির মেয়েছেলে গুইলান কি সব আজেবাজে কথা যে কয়। এই বাড়িতে অবশ্য এসব আজেবাজে কথা কেউ বলে না। তবুও ক্যানো যেনো মনে হয় ময়নার, বস্তির জীবনই বেশী ভাল ছিল। ময়নাদের ছোট্ট ঝুপড়িটা, এই রান্না ঘরের মত এত বড় ছিল না। পায়ের তলাটা এরকম সিমেন্ট দিয়ে পাঁকা করাও ছিল না। তবে মাটি থেকে তাঁর কোমড় সমান উঁচু একটা বাঁশের মাচান পাতা ছিল। সেই মাচানের ওপর ঘুমাত সে আর তাঁর মা। টালের দিনে টাল যে লাগত না, তা নয়, তবে যত বেশি টাল পড়ত, ময়না ততই মায়ের কাছ ঘেঁষে শুতো। মায়ের গতরের ওম আর ক্যামন যেন ঘাম ঘাম, টক টক গন্ধ–––। মায়ের কথা মনে উঠতেই বিষাদে মনটা ছেয়ে যায় ময়নার। হঠাৎ করেই মা টা যে কোথায় চলে গেল তা আজও ঠাহর করতে পারে না সে।

-উ উহু, মা গো–––। নাভির চারপাশের সেই চিন চিনে ব্যথাটা অনুভব হতেই দাঁত মুখ খিঁচে হারিয়ে যাওয়া জননীর উদ্দশ্যে আর্তনাদ করে ওঠে ময়না। ক'দিন ধরেই এরকমটা হচ্ছে। কথা নাই, বার্তা নাই, হঠাৎই বেদনাটা শুরু হয়। নাভির ঠিক মাঝখানে শুরু হয়, তারপর চিন চিন করে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। অনেকক্ষণ থাকে বেদনাটা। এ সময় কিছু একটা মুখে দিলে ভাল লাগে। কিছু না হোক, অন্ততঃ এক গেলাস ঠান্ডা পানি খেলেও বেদনাটা কিঞ্চিৎ উপশম হয়।

বেদনাটা ক্রমে ক্রমে বেড়েই চলছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ছেঁড়া কাঁথার উষ্ণতার মায়া ত্যাগ করে উঠে বসে সে। মিটসেফের নীচ তাকে, সযতনে উপুড় করে রাখা বাট ভাংগা টিনের সাদা মগটা বের করে কলের কাছে আসে। গত রাতের এঁটো হাড়ি পাতিল গুলো এখনও ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। বড় এ্যালুমিনিয়ামের পাতিলের তলদেশের পোড়া অংশের দিকে দৃষ্টি আটকে যায় ময়নার। গত রাতে মনিবের ছোট মেয়ে শিউলিমালার বিবাহের সম্মন্ধ ঠিক হয়ে গেল। সাজগোজ করে শিউলিমালা যখন বসার ঘরের দিকে যাচ্ছিল তখন কি সোন্দর যে লাগছিল ছুডো আফাকে। অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল ময়না। মনে মনে ভাবছিল, বড় হলে সেও কি ছুডো আফার মত সোন্দর করে সাজতে পারবে? তারও কি এমন করে বিয়ে হবে? বিয়ে জিনিসটা কি এখনও বোঝে না ময়না। তবে এটুকু বোঝে, বিয়ে হলে খাওয়া পরার অভাব হয় না, কেউ গাল মন্দ করে না। বিয়ে জিনিসটা খুব আনন্দের একটা জিনিস। ছুডো আফাও কালকে কি খুশি! ঠিক জাইন ঘাস ফড়িংডা, এ ঘাস থন ও ঘাস, তিড়িং, বিড়িং। খাওয়া দাওয়ার আয়োজনও খারাপ ছিল না। পোলাওয়ের গন্ধে মৌ মৌ চারিধার। গরুর গোশতের রংটাও ছিল বাহারের। সবার যখন খাওয়া দাওয়া শেষ, তখন ময়না ভেবেছিল, এইবার বুঝি বেগম সাহেবা তাকে চারটে পোলাও আর এক টুকরা গরুর গোশত, গোশত না হলেও সামান্য ঝোল––––। ময়নার সে আশা পূরণ হয়নি। অতিথ ম্যাজবান চলে যাবার পর বেগম সাহেবা সব খাবার পাতিল থেকে পেয়ালায় আজরিয়ে খাওয়ার ঘরের ঠান্ডা আলমারীতে ঢোকালো, আর তাকে দিল দুপুরের আতপ চালের ভাত সাথে লাউয়ের তরকারি। মনটা খুব ছোট হয়ে গেছিল ময়নার। কিন্তু পেটে তখন খিদা, ভীষণ খিদা, পারলে দুনিয়াডা খেয়ে ফেলে সে।

পোলাও আর গোশতের কথা মনে হতেই নাভির চারপাশের বেদনাটা চারগুন বেড়ে যায়। বা হাত দিয়ে প্রায় পিঠের সাথে লেগে আসা উদর চেপে ধরে ইতি উতি তাকায় ময়না। কি খাওয়া যায়, কি খাওয়া যায়? চারদিকে চোখ বুলাতে বুলাতে চুলার কিনারে রাখা চিনির বয়ামের দিকে নজর আটকে যায়। আবারও এদিক ওদিক তাকায় সে। বুকটায় ধড়ফড়, জিবে পানি, নাভির চারপাশে বেদনা, খিদা, ভীষণ খিদা। বড় করে একটা শ্বাস নিয়ে বয়ামের মুখা খুলে, মুঠ ভর্তি চিনি নিয়ে মুখে চালান দেয় ময়না। চিনির দু একটা দানা মুখ ফসকে মাটিতে পড়ে। ঠোঁটের কোনে আর গালেও দুচারটা দানা লেপটে থাকে। জিহবা আর কন্ঠ তালুর মাঝখানে শর্করার দানাগুলো গ্রন্থি নিঃসৃত লালা সহযোগে ধীরে ধীরে সিক্ত হতে থাকে । দ্রবীভূত চিনির পয়লা কিস্তি খাদ্য নালী বেয়ে পেটে চালান হয়ে যায়। আহ কি শান্তি। কমে আসছে, ক্রমে ক্রমে বেদনাটা কমে আসছে।
- ময়না, কি করিস রে তুই? নারী কণ্ঠে স্বনাম শুনে চমকে ফিরে তাকায় ময়না। দরজায় সাক্ষাৎ যম দূতের মত দন্ডায়মান বেগম সাহেবা। ময়নার হাতের তালুতে, ঠোঁটের কোনে, আর গালে তখনও চিনির দানা লেগে আছে। মুখের ভেতরের দানা গুলোও পুরোপুরি দ্রবিভূত হয়নি। বেগম সাহেবা কে দেখে ভূত দেখার মত চমকে থমকে যায় সে। পেটের বেদনাটা এখন আর নেই, তবে ধড়ফড়ানি আছে। বুকের ভেতর ভীষণ ধড়ফড়ানি। ইতিমধ্যে নিজের অজান্তেই দুই হাত পেছনের দিকে চলে গ্যাছে তার।
- দেখি, তোর হাতে কি? কি লুকাচ্ছিস? চোখ রাঙ্গিয়ে হুঙ্কার ছাড়ে গৃহ কর্ত্রী হামিদাবানু। নড়াচড়া লক্ষ্য করা যায় না ময়নার দিক থেকে। এবারে হামিদাবানু দুই কদম এগিয়ে এসে ময়নার লুকানো হাত ধরে ঝামটা টান মারে। হাতের তালুতে চিনির দানা দেখে প্রকৃত ঘটনা আঁচ করতে কাল বিলম্ব হয় না হামিদাবানুর।
- তুই চিনি খাচ্ছিস? এই সাত সকালেই এক গাদা চিনি খাওয়া! তোর পেটে কি রাক্ষস নাকি এ্যা? সাব্যসাচী হামিদাবানু শুধু বাক্যবানেই সীমাবদ্ধ থাকে না, কষে একটা চড়ও লাগায় ময়নার ডান গালে।
- শুধু সকাল বলেই কিচ্ছু বললাম না। রাতে ফিরে আসি, তারপর তোর মজাটা বোঝাব আমি।
এক হাত দিয়ে চড় খাওয়া গাল চেপে ধরে অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে থাকে ময়না মিনিট খানেক। পেটের চিনচিনে ব্যথাটা এখন গালে এসে টনটন করছে। বেগম সাহেবা চলে গ্যাছে আরও কিছুক্ষণ গালিগালাজ করে। ভাগ্যিস একটা মাত্র চড় মেরেছে। খণেক আগে ঘটে যাওয়া ঘটনাটা মনে মনে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করে সে। কিন্তু নিজের কোন দোষ খুঁজে পায় না। অন্ততঃ এত জোরে চড় আর একগাদা গালমন্দ খাওয়ার মত অন্যায় যে করেনি, এ ব্যাপারে ষোল আনা নিশ্চিত সে। ভীষণ কান্না পাচ্ছে তার এই মুহূর্তে। মেঝেতে ল্যাটা মেরে, মিটসেফের সাথে হেলান দিয়ে বসে যদি একটু কান্না করা যেত, তবে দিলটায় হয়ত একটু শান্তি লাগত। কিন্তু সে উপায় নেই ময়নার। রান্নাঘর থেকে যাবার সময় এক চুলায় গোসলের জন্য গরম পানি, আরেক চুলায় চা এর পানি বসাতে হুকুম করে গ্যাছে বেগম সাহেবা। আহত গাল থেকে হাত সরিয়ে চোখের কোনে জমে থাকা অশ্রুবিন্দু তালুর উলটা পিঠ দিয়ে মুছতে মুছতে হুকুম তামিলে মনোনিবেশ করে ময়না।

রান্না ঘর থেকে তপ্ত মেজাজ নিয়ে শোবার ঘরে ফিরে আসে হামিদাবানু। সক্কাল কর সক্কাল বেলায় একটা কুফা লেগে গেল। সামনে সারাটা দিনতো এখনও পড়েই আছে।
- আবার মোবাইল ফোনটা গেল কোথায়? স্বগতোক্তি করেহামিদা বানু। সেই সাথে খুঁজতে থাকে কথা বলার পোর্টেবল যন্ত্রটা। খাটের তলা, ড্রেসিং টেবিল, ড্রয়ার, ওয়্যার ড্রোব সবখানে।
- কি জ্বালায় পড়লাম রে বাবা। তবুও যদি জ্বালা একটা হতো। ঘরের মধ্যে সাক্ষাৎ চিনি চোর। দেশের মন্ত্রী মিনিস্টাররা চুরি করলে তা মানানসই হয়। কিন্তু চাকর বাকররাও যদি----- আর চাকর বাকরদেরই বা দোষ দিয়ে লাভ কি। নিজের চারপাশের পরিস্থিতি পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে তার প্রতিকূলে চলে যাচ্ছে। সেই যৌবন বয়স থেকে 'রাজনীতিক' করে হামিদা বানু। তার বাবা হবিবর চেয়ারম্যান তিরিশ বছর আড়াই হাজার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গিরি করেছে। সারা ইউনিয়ন জ্বালায়ে পোড়ায়ে ছারখার করার জন্য দেশলাইয়ের দরকার পড়ত না, হবিবর চেয়ারম্যানের তর্জনির ইশারাই যথেষ্ট ছিল। তা হবিবর চেয়ারম্যানও যেমন এখন নাই, সে যুগও তেমন এখন নাই। আর তাছাড়া এটাও আড়াই হাজার ইউনিয়ন না। কোতয়ালি, সুত্রাপুর এলাকা আর আড়াই হাজার ইউনিয়নের মধ্যে তফাৎ আসমান আর জমিন। অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে, অনেক ঘাটের জল ঘেঁটে, অনেক ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে, হামিদাবানু আজকের এই নেত্রী হামিদাবানুতে এসে পৌঁছেছে। যৌবনে কর্মী হিসেবে দলে যোগ দিয়েছিল হামিদা বানু। অনেক আন্দোলন আর ত্যাগ তিতীক্ষার পর আজকে সে কোতোয়ালি-সুত্রাপুর এলাকায় দলের মহিলা শাখার রীতিমত একজন 'দায়িত্ব'। এরই মধ্যে অবশ্য যৌবনটা গত হয়েছে। যৌবন গত হওয়া বা থাকা নিয়ে কোনদিন ভাবেনি হামিদাবানু। যৌবন তো আর চিরকাল কারও থাকে না। কিন্তু ইদানিং তাকে এই যৌবন নিয়েই ভাবতে হচ্ছে বেশী। তার এতদিনের সব পরিশ্রমকে মাত্র এক মাসের মধ্যে শুণ্যে ঠেকাতে চাইছে মিস জেরিন। কিসের জোরে? যৌবনের জোরে। কোন পাড়ার কোন বেশ্যা, নাকি বেশ্যার সর্দারনী, নাকি মক্ষীরানী, ঐ ছেনাল মাগী জেরিন তার তৈয়ার পায়েশে নুন ঢেলে দিতে চাইছে, সাজানো ভিটায় আগুন জ্বালানোর জন্য মশাল হাতে নাচন কুদন করে

বেড়াচ্ছে। এও কি সহ্য করা যায় ? আর দলের মেনিমুখো পুরুষ নেতারাও আজকাল একেবারে মিস জেরিন, মিস জেরিন বলতে অজ্ঞান। পার্টি অফিসের দাঁরোয়ান থেকে শুরু করে, সেক্রেটারী পর্যন্ত সবাই এক মাস আগেও কতনা ইজ্জত দিয়ে কথা বলত। এই তো গত জানুয়ারী মাসের কথা, দলের মহাসচিব তাকে স্বয়ং ডেকে বলল, মিস বানু, আপনার পারফরমেনসে দল যারপর নাই খুশী। আমরা যদি এবার সরকার গঠন করি তাহলে সংরক্ষিত তিরিশ মহিলা আসনের মধ্যে আপনার নম্বর একেবারে পয়লা। তাজ্জব কি বাত! একমাসের মধ্যে মহাসচিব উলটো সুরে গান গাওয়া শুরু করেছে। পার্টি অফিসের দাঁরোয়ান পর্যন্ত আজকাল তার সাথে তুচ্ছ তাচ্ছিল্ল আচরণ করে!

হ্যা, তবে সত্য কথা স্বীকার করতে চেয়ারম্যানের বেটির কোন কার্পণ্য নেই। গতর আছে বটে বেশ্যাটার। চিতল মাছের মত চিকনাই মারা পেটি, এভারেষ্টের মত দুই বুকের মাঝখানের খাঁজ, আর তুলতুলে গোশত ভরা পাছায় সাগরের ঢেউ তুলে জেরিন যখন পার্টি অফিসে আসে তখন হামিদাবানুর নিজেরই হিংসা লাগে। আর কার্তীক মাসের কুকুরের মত নারী লোলুপ বুভূক্ষু পুরুষ নেতা গুলোর মনের অবস্থা ------। কিন্তু ‘রাজনীতিক’ তো আর পাল ছাড়া কোষা নৌকা না যে সামান্য একটু ঢেউয়ে চিতপটাং দিবে। গতর দেখিয়ে কি আর সংগঠন করা যায়? পারবে নাকি মিস জেরিন, রোদ, বৃষ্টি, ঝড় মাথায় নিয়ে, দিন রাত পার্টির জন্য কাজ করতে?

নেতা নেত্রীর জন্ম দিবস, মৃত্যু দিবস, খৎনা দিবস, হারিয়ে যাওয়া দিবস, ফিরে পাওয়া দিবস, ঘোষণা দিবস, নারী দিবস, শিশু দিবস, রোজার ঈদ, বকরাঈদ, সবে বরাত আরও কতকি। এসব দিবসে নারী আর শিশু কে যোগাড় করবে? হামিদাবানু। নেতাদের মূক্তির মিছিল, হরতালের পক্ষের মিছিল, বিপক্ষের মিছিল, শোকের মিছিল, আনন্দের মিছিল, বাজেটের পক্ষের মিছিল, বিপক্ষের মিছিল, লাঠির মিছিল, ঝাড়ুর মিছিল, তা সে যে কোনো মিছিল মিটিংই হোক না ক্যানো, হামিদাবানু কোনদিন কেন্দ্রীয় নেতাদের হুকুমের অপেক্ষা করেনি। শ’ পাঁচশ নারী আর শিশুনিয়ে, গলা ফাটিয়ে, গগন বিদারী শ্লোগানে ঢাকার রাজপথ প্রকম্পিত করে রেখেছে সে বিগত দশ বছর যাবৎ। আর সেই হামিদাবানুর বিরুদ্ধে এখন একগাদা অভিযোগ এবং অভিযোগের ভিত্তিতে পার্টির মহিলা শাখার পদটার যায় যায় দিন অবস্থা।

হামিদাবানুর বিরুদ্ধে পাহাড় সমান অভিযোগের মধ্যে দুটো অভিযোগ সবচেয়ে মারাত্মক। প্রথমটি হচ্ছে তহবিল তসরুফ, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে এজমাইলি সম্পত্তির জবর দখল। পার্টির মিছিল মিটিং এ যে লোক আনা হয় তার জন্য পার্টি থেকে মাথা পিছু একটা বাজেট বরাদ্দ করা হয়। বাজেটের টাকা মাথাপিছু বন্টন করার কথা থাকলেও, বেশিরভাগ টাকাই নাকি হামিদাবানু একা আত্মসাৎ করেছে। আর সে বর্তমানে গোয়ালনগরের যে বসত বাড়িতে আছে সেটা সহ পুরোনো ঢাকার আরও তিনটি দালান সহ বাড়ি নাকি অবৈধ ভাবে ভোগ দখল করছে। ষড়যন্ত্র, তার বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। অবশ্য থোড়াই পরোয়া করে হামিদাবানু। কারণ এসব ঝুটা ইলজামের স্বপক্ষে পার্টির হাতে কোন প্রমাণই নেই।

- আমার নামও হামিদাবানু, পিতা মৃত হবিবর চেয়ারম্যান। ষড়যন্ত্রের শেকড় কিভাবে সমূলে উপড়ে ফেলতে হয়, তা আমার কাফি জানা আছে। টেবিলের ড্রয়ারে শেষবারের মত মোবাইল ফোন খোঁজ করতে করতে বিড় বিড় করে প্রতিজ্ঞা করে বিগত যৌবনা নেত্রী হামিদাবানু। এক ফাঁকে ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় নিজের প্রতিচ্ছবির দিকে চোখ আটকে যায়। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকে নিরিখ করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। কপালে, গালে, চোখের কোনে, থুতনিতে, চিবুকে, মোটের ওপর চেহারার সর্বত্র আঙ্গুল বুলিয়ে যাচাই করতে থাকে। চেহারার ভাঁজে ভাঁজে বয়সের স্পষ্ট ছাপ লক্ষ্য করে হতাশার এক দীর্ঘ শ্বাস বেরিয়ে আসে হামিদাবানুর অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে। এবারে ধীরে ধীরে বুকের আঁচল সরিয়ে জামায় ঢাকা বিগত যৌবনের ভগ্নাবশেষ নিরিখ করার প্রয়াসে বা হাত দিয়ে একটা স্তন হাল্কা করে টিপে দেখে। যুগপৎ আরেকটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে।

- নাহ, এর চাইতে ইন্ডিয়া থেকে আসা কিসমিসেও ঢের বেশী রস কষ থাকে। সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ডে নাকি নকল স্তন লাগানো যায়। একটাবার খোঁজ নিয়ে দেখলে ক্যামন হয়? মনে মনে ভাবে হামিদাবানু।

- ধুরো যা, কি সব আজে বাজে ভাবছে সে? তিন সন্তানের জননী সে। আল্লাহ পাকের অসীম রহমতে বড় মেয়ে বকুলমালার বিয়ে হয়েছে উঁচু খানদানে। জামাই বছরের নয় মাসই বাইরে বাইরে থাকে। ছেলের বনানীর বাড়িটার দামই কোটি খানেকের ওপরে আছে। বকুলমালার পরেই ছেলে আশরাফ। বুয়েটে সেকেন্ড ইয়ারে পড়ছে। কোনরকমে ইঞ্জিনিয়ারিংটা পাশ দিতে পারলেই সোজা আমেরিকায় পাঠিয়ে দিবে ছেলেকে সে। আর সবচেয়ে ছোট সন্তান শিউলিমালা। এবছর ইন্টার দিল। পড়ালেখায় মন নেই মেয়েটার। সারাদিন শুধু ডিস আর সাজ গোজ নিয়ে ব্যস্ত। তবে খুশীর খবর এই যে, বড় মেয়ের মত, ছোটটার প্রতিও আল্লাহর অশেষ রহমত নাজেল হয়েছে। ছেলে পক্ষ গতকালকেই পাঁকা কথা দিয় দিয়েছে। এখন ভালয় ভালয় কাজটা হয়ে গেলেই বাঁচোয়া।

রাতের বেলা টিউব লাইটের আলোয় ভাল করে নেকলেসটা পরখ করতে পারেনি শিউলিমালা। এখন দিনের আলোয় ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে হারটা উলটিয়ে পালটিয়ে

দেখছিল সে। ডায়মন্ড বসানো হোয়াইট গোলডের তৈরী জিনিসটা। পাত্র পক্ষ তাকে পছন্দ করেছে।

প্রথম প্রথম শিউলির মধ্যে একটু দোটানা ভাব ছিল। কিন্তু ছেলেকে দেখার পর সেই দোটানা ভাবটা আর নেই। তার হবু স্বামী আমেরিকার মিনেসোটার কোন ইউনিভার্সিটিতে পি, এইচ, ডি করছে। বিয়ের খবরটা শুনলে সোহেল ভীষণ কষ্ট পাবে। সোহেল হচ্ছে ভাইয়ার সহপাঠী। বুয়েটে দ্বিতীয় বর্ষ। ছেলে হিসেবে সোহেল অতি চমৎকার। কিন্তু চমৎকার ধোঁয়া পানি খেলে কি পেট ভরবে? নাকি এরকম ডায়মন্ডের নেকলেস পাওয়া যাবে? সোহেল যদি একটু দুঃখ পায় তো পাক না। পুরুষ মানুষের জন্মই হয়েছে মেয়েদের কাছ থেকে দুঃখ পাবার জন্য।

- হি হি হি---, নেকলেসটা গলার সামনে ধরে ডানে বায়ে হেলে দুলে নিজেকে আয়নায় পরখ করে শিউলিমালা আর সেই সাথে মনের আনন্দ প্রকাশ করে, হি হি হি-----, বলত আয়না পৃথিবীতে---

দরজায় পর্দার আড়ালে নড়াচড়ার শব্দ পেয়ে, আয়না থেকে চোখ ফেরায় শিউলি।

- কে, কে ওখানে?

- আমি ময়না, আফা। আফনের চা।

- এ এই খানে রাখ। আমি এখনই আসছি। ময়নাকে চায়ের পেয়ালা ড্রেসিং টেবিলের ওপর রাখতে বলে বাথরুমের দিকে পা বাড়ায় শিউলি।

চায়ের পেয়ালা নির্দেশিত স্থানে রাখতে গিয়ে সোনার হারটার দিকে নজর পড়ে ময়নার। এতক্ষণ পর্দার আড়াল থেকে শিউলিমালার কায়কারবার দেখছিল সে। চোখের সামনে জ্বলজ্বলে হারটা দেখে কৌতুহল সম্বরন করতে পারেনা। আলগোছে হারটা তুলে নিয়ে শিউলিমালার অনুকরণে আয়নার সামনে নিজেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রদর্শন করতে থাকে ময়না। এরই মাঝে কখন যে বাথরুম থেকে শিউলি এসে গ্যাছে তা সে টের পায়না।

আয়নার সামনে রিহার্সেলরত ময়নাকে দেখে গোস্বা দমন করতে পারেনা শিউলি। বাজ পাখির মত ছোঁ মেরে নেকলেসটা ময়নার হাত থেকে নিয়ে, আরেক হাতে চটাস একটা চড় বসিয়ে দেয়।

- কত্ত বড় সাহস ছেমড়ির। যাহ ভাগ এখান থেকে।

হাতের তালু দিয়ে চড় খাওয়া বেদনাহত গন্ডদেশ আবৃত করে অবনত মস্তকে রান্নাঘরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করে ময়না। এই বাড়ির মানুষ গুইলান জাইন ক্যামন নিঃষ্ঠুর। দিলে এতটুকু মায়া মোহাব্বত নাই। এর চেয়ে বস্তির জীবনই ভাল ছিল। অন্ততঃ এভাবে কথায় কথায় কেউ চড় থাপ্পড় দিত না। রাগে দুঃখে, ক্ষোভে, অভিমানে বুকের ভেতরটায় পাথরের মত ভারি ঠ্যাকে তার। রান্নাঘরে এসে এক কোনায় হাঁটু ভাঁজ করে মুখমন্ডল গুজে চুপচাপ বসে থাকে ময়না অনেকক্ষণ। অতীত অভিজ্ঞতা থেকে জানে সে, এভাবে বসে থাকলে বুকের পাষাণ ভারটা হালকা হয়ে যায়।

পার্টি অফিস থেকে ফিরতে ফিরতে রাত দশটা বেজে যায় হামিদাবানুর। শারীরিক আর মানসিক দু'দিক থেকেই বিধ্বস্ত সে আজ। শেষতক ছেনাল মাগীটা তার সর্বনাশ করেই ছাড়ল। মেজাজটা চড়ে আছে এক্কেবারে তাল গাছের আগায়। মাথাটাও ক্যামন যেন ঘুরছে চরকির মত। প্রেসার বেড়ে গেল কি না কে জানে। বড় মেয়ের জামাই গেল বার সিঙ্গাপুর থেকে প্রেসার মাপার মেশিন এনে দিয়েছিল। হামিদা বানু নিজে জানেনা জিনিসটা কিভাবে ব্যবহার করতে হয়। তবে শিউলিমালা জানে। প্রেসার মাপার উদ্দেশ্যে কন্যার ঘরে উঁকি মারে নেত্রী। খাটের ওপর মুখ গোমরা করে বসে আছে শিউলি।

- কি রে, কি হয়েছে? মুখ গোমরা করে বসে আছিস ক্যান? মেয়েকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন করে হামিদাবানু।

- দ্যাখো না মা, আমার নেকলেসটা পাওয়া যাচ্ছে না। ন্যাকা ন্যাকা আহল্লাদি স্বরে জবাব দেয় শিউলি। মেয়েটার চোখে মুখে ঝড়ের পূর্বাভাস। যে কোন সময় কান্না করে দেবে সে।

- কোন নেকলেস? বুঝতে না পেরে পালটা প্রশ্ন করে জননী।

- ঐ যে ইয়ে--- কালকে-- ইয়ে ---। নেকলাসটা যে তার হবু স্বামীর দেওয়া, আর হবু স্বামীর নাম বলাটা যে কিঞ্চিৎ লজ্জাস্কর, এ কথা নেকলেস হারানোর কষ্টের মাঝেও বেমালুম ভুলে যায়নি শিউলিমালা। তাই কোন নেকলেস, মায়ের এই প্রশ্নের জবাবে কিছুটা ইতস্ততঃ ভাব, আর খানিকটা আকার ইঙ্গিতের আশ্রয় নেয় সে। তবে চেহারার এই কাঁদলাম, কাঁদলাম কিন্তু মার্কা আহল্লাদি ভাবটা আগের মতই বজায় থাকে।

- বলিস কি? কোথায় রেখেছিলি? ভাল করে খোজ করেছিস? উদ্বেগ প্রকাশ করে নেত্রী।

- হ্যা, সব জায়গাতেই খুজেছি। সকালে ঘুম থেকে উঠে জিনিসটা বের করেছিলাম। তারপর---উম ম ম --একটু থেমে সকালের ঘটনা ইয়াদ করার প্রয়াস চালায় শিউলি।

- উম ম তারপর ময়না আ ---

- ময়না? ময়না কি? কন্যার অসমাপ্ত স্মৃতিচারণকে পরিণতির দিকে ঠেলতে চায় হামিদাবানু।

- আমি যখন বাথরুম থেকে আসলাম তখন দেখলাম ময়না হারটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে।

- ও বুঝেছি, হারমজাদি চোরনিরই কাজ এটা। কোথায় হারামজাদিটা কোথায়? ময়না, ঐ ময়না। শিউলিমালার ঘর থেকে হুঙ্কার দিতে দিতে রান্নাঘরের দিকে যাত্রা করে নেত্রী। মেজাজ তার এখন দুই তাল গাছ সমান চড়ে গেছে।

সারাদিন আজকে রান্নার কোন ঝামেলা ছিল না। গতরাতের পোলাও আর গোশত দিয়ে দিনের খাবার কার্যক্রম সারা হয়েছে। ময়নার বরাতেও সাঁঝের বেলায় চারটে পোলাও আর এক টুকরা গোশত জুটেছিল। পোলাওয়ের স্বাদটা এখনও জিবে লেগে আছে। ঢেকুর দিলে পোলাও পোলাও গন্ধটা নাকের মধ্যে এসে ধাক্কা মারে। পেট অবশ্য পুরোটা ভরেনি ময়নার। আর দুগা হলে পুষিয়ে যেত। পেট ভরা থাকলে নাভির চারপাশের সেই চিনচিনে বেদনাটাও থাকে না।

পোলাওয়ের কথা ভাবতে ভাবতে রান্নাঘরে পিঁড়িতে বসে বটি দিয়ে সকালের জন্য সব্জী কুটছিল ময়না। আচমকা বেগম সাহেবার উত্তেজিত কন্ঠ নিঃসৃত ময়না ডাক শুনতে পেয়ে তাৎক্ষনিক ভাবে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে তরকারি কুটা স্থগিত রেখে উঠে দঁড়ায় সে। প্রায় সাথে সাথেই ঝড়ের বেগে হামিদাবানু রান্নাঘরে হাজির হয়। পেছনে পেছনে কন্যা শিউলিমালা।

- হার কোথায় রেখেছিস? চোখ পাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে গৃহকর্ত্রী হামিদাবানু। প্রশ্নটা ঠিক ঠাহর করতে পারেনা ময়না। কাচুমাচু হয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বেগম সাহেবার দিকে তাকাতেই শরীরের সমস্ত রক্ত হিম হয়ে যায় তার। ঢোক গিলতে গিয়ে টের পায় কন্ঠ এক্কেবারে শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে।

- কত্ত বড় সাহস হারামজাদীর। চোরনির ঘরের চোরনি, শীগগির বল হার চুরি করে কোথায় রাখছস? এবারে কিছুটা বুঝতে পারে ময়না। ঘরের ভেতর থেকে কোন জিনিস চুরি গেছে, আর বেগম সাহেবার ধারণা জিনিসটা সে ই চুরি করেছে।

- আ আমি কিছু চুরি করি নাই গো আম্মা। শুকিয়ে যাওয়া কণ্ঠে ফ্যাসফ্যাস করে কোনমতে আত্মপক্ষ সমর্থন করে ময়না।

- নেস নাই, না? ফের মিথ্যা কথা! বা হাত দিয়ে আসামীর চুলের মুঠি ধরে ডান হাত দিয়ে ঠাস একটা চড় বসায় হামিদাবানু। হাউমাউ করে কেঁদে ফেলে ময়না।

- আমি কিচ্ছু চুরি করি নাই গো আম্মা বিশ্বাস করেন। নতজানু হয়ে দুই হাত দিয়ে বেগম সাহেবার পা জড়িয়ে ধরতে উদ্দত হয় ময়না। কিন্তু হামিদাবানুর হাতের মুঠায় চুল আটকা থাকায় পদযুগল পর্যন্ত পৌছতে পারে না।

ক্রন্দনরত নতজানু ময়নাকে দেখে ক্ষণিকের জন্য সমস্ত দিনের অপমান আর গ্লানির জঞ্জাল সিনেমার ফ্লাশ ব্যাকের মত ভেসে ওঠে নেত্রী হামিদাবানুর অক্ষিপটে। সম্মুখে হাতজোড়, আর ক্রন্দনরত শিশুটি আর তখন শিশু থাকে না, হয়ে যায় ছেনাল মাগী, বেশ্যার সর্দারনী মিস জেরিন। ইসসিরে এমনি করে যদি ঐ বেশ্যাটা তার পায়ের তলে উপুড় হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করত। কল্পনার মানসপটে নতজানু মিস জেরিনের আবির্ভাব হওয়াতে হামিদাবানুর উত্তেজনা শতগুণে বেড়ে যায়। বা হাতে চুলের মুঠি ধরা অবস্থাতেই ঘাড় ঘুরিয়ে ডাইনে বায়ে, সামনে পেছনে তাকিয়ে লাঠি সোটা জাতীয় কিছু একটা খুঁজতে থাকে সে। পেয়েও যায়, দরজা আটকানোর কাঠের ডাসা। এবারে ময়নার চুলের মুঠি ছেড়ে দিয়ে দুই হাতে শক্ত করে ডাসাটা ধরে পিঠ বরাবর আঘাত করতে উদ্দত হয়, সেই সাথে গলগল করে এক গাদা খিস্তি খেউড় বেরিয়ে আসে। মেঝেতে ধপাস করে পড়ে যায় ময়না। লাঠির আঘাতের আলামত টের পেয়ে যুগপৎ বাম হাত মেঝেতে ঠেকিয়ে শরীরের ভার সামলায়, আর অন্য হাতে শুন্যে ভেসে আসা লাঠির আঘাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার বৃথা চেষ্টা চালায় ময়না। হাউমাউ করে কেঁদে আকুতি জানায় সে,

- আমারে আর মাইরেননা গো আম্মা, আমি কিছু চুরি করি নাই। ও আফা আমারে বাচান। আমারে মাইরা ফালাইল, আমারে বাচান।

কোন সাহায্য আসে না অদূরে দন্ডায়মান শিউলিমালার কাছ থেকে। জেরিনের ওপর প্রতিশোধ নেবার পরম আনন্দে, উত্তেজনার চরম পর্যায়ে পৌছে গেছে ততক্ষণে নেত্রী হামিদাবানু। আঘাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য আকুল আর্তি জানাতে থাকে ময়না, আর সেই সাথে কাত হয়ে বসা অবস্থাতেই এক হাতে ভর করে ছেঁচড়িয়ে ছেঁচড়িয়ে পেছাতে থাকে। কিন্তু উপুর্যুপুরি আঘাত আসায় ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে না। পাশেই দাঁড় করিয়ে রাখা ধারালো বটিটায় বা হাতের কব্জি কচাৎ করে আটকে যায়। পরক্ষণেই চিরিক দিয়ে রক্ত ছোটা শুরু হয়। অক্ষত হাত দিয়ে, কাটা হাত টা চেপে ধরে মেঝেতে গড়িয়ে পড়ে ময়না।

রক্ত দেখে কিছুটা স্তিমিত হয় হামিদাবানু। পাশ থেকে শিউলিমালাও এবারে জননীকে রণে ভঙ্গ দেবার অনুরোধ জানাতে থাকে।

ক্রিং, ক্রিং, ক্রিং------ ড্রইং রুম থেকে ক্রমাগত ফোন বাজার শব্দ শুনে ফোন ধরতে ড্রইং রুমের উদ্দেশ্য দৌড় দেয় শিউলি। কন্যার অনুরোধে হোক আর ফোনের শব্দেই হোক আপাতত রণে ভঙ্গ দেয় হামিদাবানু। এখন বেশ তৃপ্তি বোধ করছে সে।

- আম্মু তোমার ফোন, থানা থেকে। ড্রইং রুম থেকে শিউলিমালার ডাক আসে।

কপাল কুচকায় নেত্রী। থানা থেকে আবার কি চায়?

- ধরতে বল আমি আসছি। হাতের লাঠি খটাং করে মেঝেতে ফেলে, বাতি নিভিয়ে, বাইরে থেকে রান্নাঘরের শেকল টেনে ড্রইং রুমে আসে হামিদাবানু।
- হ্যালো, মিস হামিদাবানু বলছি। ফোন কর্তাকে নিজের উপস্থিতি জানায় নেত্রী।

অন্য প্রান্তে কি কথা হচ্ছে তা শুনতে পায়না শিউলি, কিন্তু এই প্রান্তে মায়ের কুচকানো কপাল, উদ্বিগ্ন মুখাবয়ব, হু হা, আচ্ছা ঠিক আছে জাতীয় সংক্ষিপ্ত বাক্যালাপে অশুভ কোন ঘটনার আলামত টের পায় সে। মায়ের দূরালাপনি শেষ হতেই জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে তাকায় শিউলি।
- তোর ভাইয়াকে থানায় ধরে নিয়ে গেছে। ওসি সাহেব ফোন করেছিল। কি কারণ তা বিস্তারিত জানায়নি। কথা অসম্পূর্ন রেখেই ধপাস করে সোফায় বসে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে নেত্রী।
- আমার হাত পা কেমন যেন অবশ হয়ে যাচ্ছে। তোর আব্বু যদি এসময় থাকত! তার ব্যাংকক সিঙ্গাপুর যে কবে শেষ হবে তা আল্লাহই জানে।
- এখন কি হবে আম্মু?
- কি আর হবে থানায় গিয়ে ছুটিয়ে আনতে হবে। ড্রাইভার, এই ড্রাইভার। সোফায় বসা থেকেই হাঁক ছাড়ে হামিদাবানু। এই ড্রাইভার ব্যাটার নামটা তার কিছুতেই মনে থাকে না। অবশ্য প্রতি মাসে এক জন করে ড্রাইভার বদলি হলে নাম মনে না থাকারই কথা। আরও দুইবার হাঁক ছাড়ে সে, ড্রাইভার, ঐ ড্রাইভার বলে। প্রতিউত্তর না পেয়ে নিজেই এগিয়ে যায় ড্রাইভারের খোঁজে।

বাতি নিভিয়ে, বাইরে থেকে দরজা আটকিয়ে বেগম সাহেবা চলে যাবার পরও অনেকক্ষণ জবাই করা মুরগীর মত যন্ত্রণায় মেঝেতে ছটফট করতে থাকে ময়না। আষাঢ় মাসের বানের মত কলকলিয়ে রক্ত ছুটছে কাটা হাত থেকে। অক্ষত হাত দিয়ে ক্ষত হাতটাকে আরও শক্ত করে আঁকড়ে ধরে সে। ধীরে ধীরে অসাড় হয়ে আসছে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলো। পিঠের নীচটা কেমন যেন ভেজা ভেজা, স্যাঁতসেতে লাগছে। মাদুরটা বেছাতে পারলে আর সেই সাথে ছেড়া কাথাটা গতরে জড়াতে পারলে মন্দ হত না। পিপাসাও লেগেছে বহুত। এক মগ ঠান্ডা পানি যদি পাওয়া যেত। মাথা সহ শরীরের উপরি ভাগ দিয়ে জোর খাটিয়ে উঠে বসার চেষ্টা করে ময়না। কিন্তু পারে না। অনেকক্ষণ চেষ্টা করার পর মাথাটা সামান্য উঁচু করতে পারে মাত্র। সামান্য জিরিয়ে আবারও চেষ্টা করে। পারে না। দুবার চেষ্টাতেই হাপিয়ে উঠেছে সে। জানালার ফাঁক গলে রাস্তার বিজলি বাতির চিকন সতেজ আলোকরশ্মি এতক্ষণ ঘরটাকে আলোকিত করে রেখেছিল। সেই আলোও ক্রমশঃ ফিঁকে হয়ে আসছে। হাতের টনটনে ব্যথাটা খুব একটা বোধ হচ্ছে না। তবে প্রচন্ড শীত লাগছে ময়নার। একটা কাথা যদি গায়ের ওপর কেউ দিয়ে দিত! হঠাৎই মায়ের কথা মনে পড়ে তার। মা টা যে আচানক কোথায় বেপাত্তা হয়ে গেল তা আজও বোধে আসে না। সদরঘাট বস্তির সেই ঘুপচি ঘরে তাকে ঘুমে রেখে নিত্যিদিন মা তার বাইরে যেত। ফিরত সেই সাঁঝের কালে। সঙ্গে থাকত একথালা ভাত, কিনারে যৎসামান্য সালুন। কোনদিন শাকপাতা, কচু ঘেচু, কোনদিন মাছের কাটাকুটি, কোনদিন বা গোশতের হাড়গোড়। মা বেটিতে মিলে, মাচানের ওপর বসে খুব আয়েশ করে সেই ভাত দুটো খেয়ে নিত। থালার কোনায় সামান্য একটু সালুন মাখা ভাত থেকেও যেত। সকালে ঘুম থেকে উঠে ময়না সেই ভাত দিয়ে উদর আংশিক পূরন করত। তারপর সারাটাদিন কাটত মন্দ না। কখনও চৌকাঠের ওপর উদাস হয়ে বসে থেকে, কখনও পাশের ঘরের আম্বিয়া খালার দুধের বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে আঁদর করে কেটে যেত একরকম। আম্বিয়া খালা তাকে মোহাব্বত করত বেশ। মোয়াটা, কি মুড়িটা, কি খোশবু ওয়ালা বিস্কিটটা, মোটের ওপর প্রতিদিন কিছু না কিছু ময়নার জুটে যেত আম্বিয়া খালার কাছ থেকে। দেখতে দেখতে বেলা পড়ে আসত। যথারীতি মায়ের আগমন, চারটে পানি পান্তা, তারপর ঘুম, শান্তির ঘুম। মায়ের আসতে কখনও সখনও দেরি হলে, ময়না তার তেলচিটে বালিশের তলা থেকে সযতনে রাখা আদর্শলিপি বইটা বের করে পাতা উলটিয়ে দেখত। এই বইটা তাকে দিয়েছিল সোন্দর মত এক মাস্টারনী আফা। মাস্টারনী আফা তার হাতে বইটা দিয়ে বলেছিল-
- এই মেয়ে তোমার নাম কি?
- ময়না।
-বয়স কত? বয়সের ব্যাপারটা ময়না ঠিক বোঝে না। তাই হা করে তাকিয়েছিল সে। মাস্টারনি আফা সেদিন আরও সোন্দর সোন্দর কথা তাকে বলেছিল, কিন্তু এখন মনে পড়ছে না তার। তবে ঐ সুন্দর মত মহিলা যে তাকে বারবার ইস্কুলে যেতে বলেছিল, এ ব্যাপারটা তার স্পষ্ট খেয়াল আছে। ইস্কুলে আর যাওয়া হয়ে ওঠেনি ময়নার।

সেদিনের কথা পরিস্কার মনে আছে ময়নার। সকাল থেকে ঝুম বৃষ্টি। শরীরটা ম্যাজ ম্যাজ করছিল। সারাদিন কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়েছিল সে। এমনকি আম্বিয়া খালার ঘরেও যায়নি। দেখতে দেখতে সন্ধ্যা নামল। মায়ের অপেক্ষায় আছে ময়না, মা আসে না। সাঁঝ গড়িয়ে নিশী গভীর হয়। অপেক্ষা করতে করতে একসময় দুচোখে রাজ্যের নিদ নেমে আসে। পরদিন সকালে আম্বিয়া খালা এসে ঘুম ভাঙ্গায়।
- আলো ময়না, তর মায় কুনে? রাইতে আহে নাই? শোয়া থেকে উঠে বসে ডাইনে বায়ে মাথা নাড়ে ময়না।
- কসকি! কিছু খাইছস?

- না।
- আইচ্ছা নু যাই, আমার ঘরে যাই। দুগা পান্তা আছে। খাইয়্যা নে।

গোগ্রাসে পান্তা টুকু খেয়ে আবারও অপেক্ষা করতে থাকে সে। একদিন, দুই দিন, তিন দিন কাটল তার এভাবে, আম্বিয়ার আশ্রয়ে। চতুর্থ দিনের মাথায়, আম্বিয়ার হাত ধরে এই বাড়িতে এসে হাজির হল ময়না।

চলে যাবার আগে ময়নার বুকে, মাথায়, পিঠে হাত বুলিয়ে আঁদর করে বলেছিল আম্বিয়া খালা-
-এইহানে থাক, খাওয়া পরার অবাব অইব না। এরা খুব বালা মানুষ। ঠিক মত থাহিস। তর মায় আইলেই আমি খবর দিমু।

এরা কি বালা মানুষ? বুঝতে পারে না ঠিক ময়না। বালা মানুষ হলে বিনা দোষে এইভাবে কেউ মারতে পারত? হারটা সে সকালে একবার হাত দিয়ে ছুয়েছিল ঠিকই। কিন্তু চুরি করেনি। হার চুরি করে লাভ কি তার? যখন ভীষণ খিদা পায়, নাভির চারধারে বেদনাটা যখন চিনচিন করে ওঠে তখন একটু কিছু মুখে দিলে খুব আরাম লাগে। সোনার হারতো আর মুখে দেওয়া যায় না। নিশীথ কালে, চাইরধারে যখন ঝুম আন্ধার, ছেড়া কাঁথার ফাঁক গলে শিশ কেটে টালকা বাতাস যখন চামড়া ভেদ করে হাঁড়ে হাঁড়ে কাঁপন লাগায়, তখন মনে হয় মায়ের গতর থেকে যদি একটু ওম নেওয়া যেত, আর সেই সাথে টকটক, ঘামঘাম গন্ধটা। সোনার হার জড়িয়ে শুয়ে থাকলে কি মায়ের শরীরের ওম আর গন্ধটা পাবে সে?

এইখানকার মানুষ গুইল্যান এত ফাষান ক্যা? মায়ের মুখে একবার ফরীর হাস্তর শুনেছিল ময়না। দুনিয়ার মানুষের যখন খুব কষ্ট হয়, তখন আসমান থেকে পরী নেমে আসে। আসমানের পরী জমিনে নেমে এসে মানুষটাকে নিয়ে আবার আসমানে উড়াল দেয়। ইসসিরে, আসত যদি এখন একটা পরী নেমে । তার যে ভীষণ কষ্ট। ফরীটা তাকে ডানায় চাপিয়ে উড়িয়ে নিয়ে যেত অন্য কোন দুইন্যায়। যেই দুইন্যার মানুষ গুইল্যান এত ফাষান না। সে দুনিয়ায় কোন কষ্ট নেই। খুব বেশী কিছু তো চায়না ময়না। দু বেলা দু মুঠো আহার। পোলাও, গোশতের দরকার নেই। পানি পান্তা, সাথে কচু ঘেচু। তা না হলে একটু কাচা মরিচ, আর নুনের ছিটা। পরনের কাপড়টা কোনরকম হলেই চলবে। ঘুমানোর জন্য লেপ তোষক আর পাকা মেঝের দরকার নেই। শুধু মায়ের শরীরের ওম আর টকটক, ঘামঘাম গন্ধটা হলেই চলবে। আর সকাল, বিকাল, কি সাঁঝের বেলা, যখনই সুযোগ হয় মাস্টারনী আফার দেওয়া অ আ ই উ বইটা সুর করে পড়া। ব্যাস, ব্যাস আর কোন চাওয়া নেই ময়নার। আসবে নাকি আসমানের ফরী তাকে ডানায় তুলে নিতে?
- আয়, আয়————ফরী আয়, আয় আয়। জানালার ফাঁক গলে আলোক রশ্মি তীরের মত এসে বেধে ময়নার অক্ষিগোলকে। সেই আলোক রশ্মির উৎসেরও অনেক পেছনে এক অসীম শুন্যতা। অসীম শুন্যতার গাড় অন্ধকার বুক চিঁড়ে হঠাৎই উদয় হয় বিশাল দুই ডানা ওয়ালা এক পরী। ওইতো আসছে পরী, ময়নার দিকেই আসছে। আয় আয় ফরী আয়। পরীটা যতই তার দিকে আসতে থাকে, আলোর তেজ যেন ততই তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। যন্ত্রণা হচ্ছে ময়নার, ভীষণ যন্ত্রণা। তা যন্ত্রণা একটু হলোই বা, তবুও সে চোখের পাতা বন্ধ করবে না। দু'চোখ ভরে দেখতে চায় সে পরীটাকে। এই পরীই যে তাকে নিয়ে যাবে শান্তির সেই দুনিয়ায়। যত কষ্টতো এই দুনিয়ায়। আজকেই, এখনই, এই মূহুর্তেই সব কষ্টের পরিসমাপ্তি। তারপর? শান্তি, শুধুই শান্তি, সীমাহীন শান্তি।

খুব কাছে এসে পড়েছে পরীটা, খুউব কাছে। এত কাছে যে হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়। কাল বিলম্ব করে না ময়না। দু হাত বাড়িয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে সে, আসমান থেকে ডানা মেলে উড়ে আসা শান্তির পরীটাকে।

কোতোয়ালী থানার ওসি নবীউল্লাহ বছর দুই আগে উথুলিয়া থানা থেকে বদলি হয়ে কোতোয়ালী থানায় এসেছে। সরকার পরিবর্তন হয়ে এখন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমল। গত একমাসে, শুধু ঢাকা শহরই না, সমস্ত বাংলাদেশের থানাপতিরা অন্ততঃ একবার, আবার কেউ কেউ দুবার পর্যন্ত বদলির হুকুম পেয়ে গেছে। কিন্তু নবীউল্লাহ ওসি যেখানে ছিল, সেখানেই আছে। নবীউল্লাহ যে বহুত এলেমদার পুলিশ অফিসার, সে সম্পর্কে হামিদাবানু আগে থেকেই ওয়াকিবহাল। কাজেই ছেলের এ্যারেস্টের খবরে ভেতরে ভেতরে উত্তেজিত হলেও বাইরে এক্কেবারে শ্বাপদ শীতল ভাব দেখানোর প্রয়াস চালাচ্ছে সে। সময়টা তার এমনিতেই খারাপ যাচ্ছে। ওসির মুখ থেকে ঘটনা যা শোনা গেল তার সারমর্ম হচ্ছে যে, বাদামতলীর কোন এক চালের আড়তের পেছনে অনেক দিন ধরেই ফেনসিডিল সহ অন্যান্য মাদক দ্রব্যের রমরমা ব্যবসা চলে আসছিল। রাজনৈতিক সরকার ক্ষমতায় ছিল বলে থানা পুলিশ এ ব্যাপারে খুব একটা গা করেনি। কিন্তু এখন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শাসন। নাকে তেল দিয়ে ঘুমানোর সময় এখন না।

ঘটনার বয়ান হামিদাবানুর উদ্দেশ্য হলেও, ওসি নবীউল্লাহর দৃষ্টি বারবার আটকে যাচ্ছিল মায়ের পাশে বসা অষ্টাদশী শিউলিমালার দিকে। ব্যাপারটা হামিদাবানুর দৃষ্টি এড়ায় না। নবীউল্লাহ দারোগার যে অল্প স্বল্প না, বেশ ভাল রকমের আলুর দোষ আছে সে সম্পর্কে

হামিদাবানু পূর্বজ্ঞাত। আর সে জন্যই থানায় আসার সময়, শিউলিমালা যখন আগ বাড়িয়ে বলল, মা আমি তোমার সাথে আসি? তখন আপত্তি জানায়নি সে। যে রোগের যে দাওয়াই।

- তা মনে করেন যে, আখড়া রেইড দেওয়ার পর গনিমতের মাল সহ মোট সতের জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অবশ্য এদের মধ্যে আপনার ছেলের নাম নাই। হে হে হে---। নবীউল্লাহ দারোগা দুই হাত কচলিয়ে একবার হামিদাবানুর দিকে তাকায়, আরেকবার তাকায় শিউলিমালার দিকে । কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে হাত কচলাতে কচলাতে আবার শুরু করে নবী দারোগা,

- মনে করেন যে, আপনি নিজেদের লোক, কিন্তু ধরেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমল, ----- সময়টা খারাপ।

ঠিক তাই। সময়টা খারাপ। মনে মনে ভাবে নেত্রী। তা না হলে নবী দারোগা তার সামনে হাত কচলায় টাকার জন্য? হারামজাদার পাছার কাপড় উদাম করে, সপাং, সপাং দু ঘা তালেবানি দোররা মেরে আধা কেজি নুনের ছিটা দিতে পারলে দিলটায় একটু শান্তি মিলত। কিন্তু মনের জ্বালা, সাত জমিন নীচে জেনদা দাফন করে হাস্য বদনে বলতে শুরু করে হামিদাবানু,

- ওসি সাহেব! সেই যৌবনকাল থেকে 'রাজনীতিক' করে আসছি আমি। অত্র এলাকার আমিতো একজন 'দায়িত্ব' নাকি? ওসির দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে কোনরকম বিরতি না দিয়েই আবারও বলতে থাকে নেত্রী,

- 'রাজনীতিক' করলে, এলাকাবাসির দেখভাল করতে গেলে পদে পদে শত্রু তৈরী হয়। আমার ছেলে সোনার টুকরা ছেলে। আমার বিরুদ্ধে আমার প্রতিপক্ষরা ষড়যন্ত্রের নীল নক্সা তৈরী করেছে। তার অংশ হেসাবেই আমার ছেলেকে --- কথা অসমাপ্ত রেখে ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে পলিথিনে মোড়া এক বান্ডিল নোট বের করে টেবিলের ওপর রাখে হামিদাবানু। চিলের মত ছোঁ মেরে বান্ডিলটা তুলে নিয়ে বসা অবস্থায় ঈষৎ কাত হয়ে প্যান্টের পকেটে চালান দিয়ে দেয় নবী দারোগা। সেই সাথে হাত কচলানোও বন্ধ হয়ে যায়। পরমুহূর্তে কিছু একটা মনে পড়ার ভঙ্গিতে বলে,

- ও ভাল কথা, মিস বানু। যে লোকটা মাদক বিক্রি করত তার কাছ থেকে একটা জিনিস পাওয়া গেছে। জিনিসটা নাকি আপনার ছেলে ওকে দিয়েছে বকেয়া শোধ বাবদ। ড্রয়ার খুলে ডায়মন্ড বসানো নেকলেসটা হামিদাবানুর সামনে দোকানদারের মত মেলে ধরে নবীউল্লাহ।

- দ্যাখেনতো, জিনিসটা আপনার কিনা?

চোখের সামনে প্রিয়তমের দেওয়া উপহারটা জ্বলজ্বল করতে দেখে উত্তেজনায় জিনিসটার মালিকানা দাবী করতে উদ্দত হয় শিউলিমালা। কিন্তু পরমূহুর্তে উরুর ওপর জননীর হাতের মৃদু চাপে কিছু বলতে গিয়েও বলে না শিউলিমালা।

- না না ওসি সাহেব। আমার এ ধরণের কোন হার নেই। আর আমার ছেলে এ জিনিস পাবে কোথা থেকে?

হামিদাবানু হারটার মালিকানা স্বীকার না করায় যারপরনাই খুশী হয় নবী দারোগা। আজকের দিনটা তার মন্দ গেল না।

ছেলেকে নিয়ে ঘরে ফেরার পর ময়নার কথা খেয়াল হয় হামিদাবানুর। ছেমড়িটাকে এরকম করে মারা উচিৎ হয়নি । মেয়েটার হাতও কেটে গিয়েছিল বোধহয় একটু। এখন কি অবস্থায় আছে তা দেখবার জন্য ময়নাকে ডাক দেয়।

- ময়না, ও ময়না। দু তিন বার ডাকার পর মনে পড়ে, প্রহার পর্ব শেষ করার পর সে বাইরে থেকে দরজার শেকল টেনে দিয়েছিল। কথাটা মনে পড়তেই ধুপধাপ দৌড়ে গিয়ে শেকল খুলে রান্না ঘরে ঢোকে হামিদাবানু। ঘরময় গাঢ় অন্ধকার। দেয়াল হাতড়ে বাতি জ্বালিয়ে মেঝেতে তাকাতেই আৎকে ওঠে সে। পুরোটা মেঝে রক্তে রক্তে সয়লাব। ঘরের ঠিক মাঝখানে উত্তর দিকে শিয়র রেখে সটান চিৎ হয়ে পড়ে আছে ময়নার হাড্ডিসার ছোট্ট দেহখানা। হাতদুটো বুকের ওপর আলিঙ্গনের ভঙ্গিতে ভাঁজ করা, বুকের পাঁজর ওঠানামার কোন লক্ষণ নেই। মায়া হরিনীর মত চোখ দুটো পুরোপুরি খোলা। সেই চোখের দু'কোন বেয়ে শুকিয়ে যাওয়া নদীর গতি পথের মত কালসে একটা দাগ দু'গাল বেয়ে ঠোঁটের প্রান্তে এসে থেমে গেছে।

শরীরের সমস্ত রক্ত হিম হয়ে যায় নেত্রীর, বুকের ভেতরটায় হাতুড়ি পেটার ধক ধক শব্দ হয়। শায়িত ময়নার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে কাঁপা কাঁপা গলায় ডাকে হামিদাবানু,

- ময়না, ও ময়না। কোন সাড়া নেই। এবারে দু বাহু স্পর্শ করে মৃদু ঝাকুনি দিয়ে ডাকে, ময়না, ও ময়না। ময়না কোন কথা কয়না। স্থির নিস্তব্ধ, পাথরের মত নিঃস্পলক তাকিয়ে থাকে শুধু। কত প্রশ্ন, কত শত জিজ্ঞাসা যেন তার সেই অপলক চাহনীতে। য্যানো ময়না বলতে চাইছে,

- মানুষ গুইল্যান এত ফাষান ক্যা? খুব বেশী কিছুতো চাইনাই আমি। দুই বেলা দুই মুঠ পানি পান্তা, মায়ের গতরের ওম আর টকটক, ঘামঘাম গন্ধ, নতুন পুরানো যা কিছু হয় একটা কি দুইটা জামা, আর মাস্টারনি আফার দেওয়া সেই বইডা সুর কইরা পড়া-- অ আ ই উ ---। দুইন্যার মানুষ গুইল্যান আমারে এসবের কিছুই দেই নাই। মানুষ গুইল্যান এত ফাষান ক্যা?

ময়নার সেই অব্যক্ত প্রশ্নগুলো বুঝতে পারেনা হামিদাবানু। হামিদাবানুরা এতসব বুঝতেও চায় না।

টরন্টো
সোমবার, আগস্ট ১৯,২০০২
akash@sonalibangla.com